মহান আল্লাহর নামে

যিনি পরম করুণাময়, মহান দয়ালু

ইহুদিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

সহসম্পাদনা	কামরুল হাসান নকীব
বানান ও ভাষারীতি	মোঃ ইমতিয়াজ উদ্‌দীন খান, আবদুর রহমান রাফি
পৃষ্ঠাসজ্জা	ইসমাইল মারুফ
প্রচ্ছদ	-

ইহুদিবাদের
বিরুদ্ধে সংগ্রাম

মূল
সাইয়দে কুতুব শহদি রহ.

সম্পাদনা
আবু তাসময়িা আহমদ রফকি

SEAN
PUBLICATION

সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

ইহুদিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

সাইয়েদ কুতুব শহিদ রহ.

স্বত্ব: সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

প্রচ্ছদ © সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

প্রথম প্রকাশ

শাওয়াল ১৪৪৬ হিজরি, এপ্রিল ২০২৫

ISBN:

MRP:

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ যেকোনো উপায়েই ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা বা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়। বইটির অনুমোদিত অনলাইন সংস্করণ কিনুন। কপিরাইটকৃত বই বেআইনিভাবে কিনে পাইরেসিকে উৎসাহিত করবেন না। ধন্যবাদ।

সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

২য় তলা, ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।

+৮৮ ০১৭৫ ৩৩৪৪ ৮১১

ইসলামে গ্রন্থস্বত্বের বিধান

গ্রন্থস্বত্ব ইসলামি শরিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। ইসলাম প্রত্যেক লেখকের রচিত সকল রচনাকে তার ব্যক্তিগত সম্পদ বলে ঘোষণা করেছে এবং এতৎসংশ্লিষ্ট সার্বিক অধিকারও তার জন্য সংরক্ষণ করেছে। পাশাপাশি কেউ যেন গ্রন্থস্বত্ব-আইন লঙ্ঘন করে তার সে-অধিকার হরণ কিংবা রহিত করতে না পারে, সে-নিশ্চয়তাও বিধান করেছে। ইসলামি শরিয়ার সকল দলিল-প্রমাণ ও মূলনীতি সে-প্রমাণই বহন করছে।

গ্রন্থ-রচনা গ্রন্থকারের নিজেরই বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রমের ফসল ও অর্জন। এ-অর্জন একান্তভাবে তারই। তার অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ কোনোভাবেই তার এ-সম্পদ ব্যবহার করতে পারবে না। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

> কোনো মুসলিম ব্যক্তির সম্পদ সে নিজে খুশিমনে প্রদান না করলে কারও জন্য কোনোভাবেই তা হালাল হবে না। [সহিহ আল-জামি আস-সাগির, হাদিস: ৭৬৬২]

অতএব, গ্রন্থকারের অনুমতি ছাড়া তার রচিত গ্রন্থ হতে আংশিক বা পূর্ণ কপি করা, ছাপানো এবং তা বেচাকেনা করা ইসলামি শরিয়তে নিষিদ্ধ ও হারাম; কেননা তা অন্যায় উপার্জন ও ভক্ষণের শামিল। আল্লাহ ﷻ বলেন—

> ...তোমরা পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না। [আল-কুরআন ০২:১৮৮]

অধিকন্তু এটা শরিয়ার সীমালঙ্ঘন বলে গণ্য হবে বিধায় শরিয়তের নিষিদ্ধ কাজেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ ﷻ বলেন—

> ...তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না; কেননা আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না। [আল-কুরআন ০৫: ৮৭]

শিরোনাম

হে জানবাজ ভাইয়েরা, এগিয়ে যাও!
ফিলিস্তিনি বীরদের জন্য তোমরা কী করেছ?
আত্মত্যাগের অঙ্গীকার ও ত্যাগের মিছিল
ইহুদিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম
ইসলাম কোনো জাদুমন্ত্র নয়; এটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা
ইসলামী আন্দোলনের স্বরূপ
আত্মপরিচয়ের সন্ধানে—আমরা কারা?
মুক্তির পথ কোনটি?
জিহাদ-বিরাগীদের প্রতি আহবান

হে জানবাজ ভাইয়েরা, এগিয়ে যাও!

আল্লাহ বলেছেন—

> ‘তোমাদের মধ্যে যদি বিশজন ধৈর্যশীল লোক থাকে, তবে তারা দু’শ কাফিরকে পরাস্ত করবে। আর যদি তোমাদের মধ্যে একশ জন থাকে, তবে তারা এক হাজার কাফিরকে পরাজিত করবে।’ (সুরা আনফাল: ৬৫)

সময় এসেছে—সকল অস্পষ্টতা ও দ্ব্যর্থতা ঝেড়ে সরকারকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয়ার... সময় এসেছে দৃঢ়ভাবে বলার—জানবাজ মুজাহিদ ভাইয়েরা কিছুতেই সরকারের চক্রান্তের খাঁচায় পড়ে আত্মসমর্পণ করবে না! এত সহজে আমরা আমাদের দায়িত্ব থেকে সরে যাবো না! সরকার যা খুশি করে যাবে, আর আমরা কিছুই বলব না, এমনটি হতে পারে না। সরকারের হাত নানা আন্তর্জাতিক চুক্তিতে বাঁধা। এরা পুরনো নিয়মে চলতে চায়। যুদ্ধের মধ্যেও এরা শান্তির কথা ভাবে। কূটনৈতিক সমাধান খোঁজে। অথচ আজ মিশরের মানুষের রক্ত ঝরছে, ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে তাঁদের ইজ্জত আব্রু!

এই সরকার এখনও ভাবে, আমরা ইংরেজদের সাথে শান্তিতে আছি। তাই এরা দুই দেশের মধ্যে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও কূটনৈতিক সম্পর্ক ভালো রাখতে চায়। ব্যবসা-বাণিজ্য ঠিক রাখতে চায়। এবং মিশরীয় পুলিশ দিয়ে ইংরেজদের হাতে আমাদের জানবাজ যোদ্ধাদের ধরিয়ে দিতে চায়, অপহৃত অস্ত্র খোঁজার নামে ঘরবাড়ি তছনছ করে যায়।

এই সরকার সেই সরকার নয়, যাদের কাছে আমরা অস্ত্র জমা দিয়ে

আত্মসমর্পণ করে সরকারের পোষা বাহিনী হয়ে যাব; যেমনটা তারা সেনাবাহিনী ও পুলিশের সাথে করেছে। এবং সরকার আমাদেরকে দিয়ে কিছুতেই ইংরেজদের হারানো অস্ত্র খুঁজে জব্দ করার কাজ করাতে পারবে না, যেমনটি তারা পুলিশবাহিনী দিয়ে করাচ্ছে।

আমি এই সরকারকে বেইমান বলছি না, আমি শুধু সত্যিটা বলছি। এরা সংগ্রামী সরকার নয়। এরা এখনও শান্তিচুক্তি, কূটনীতি ও টেবিল বৈঠকের চিন্তায় পড়ে আছে। শুধু প্রতিবাদপত্র পাঠিয়েই এরা খালাস হয়ে যেতে চাচ্ছে।

সরকারকে আমি যুদ্ধ ঘোষণা করতে বলছি না, বা এই মুহূর্তে সেনাবাহিনীকে যুদ্ধে ঠেলে দিতেও বলছি না। আমি শুধু চাই, সরকার যেন জনগণকে তাদের দায়িত্ব পালন করতে বাধা না দেয়। যদি সরকার বাধা দেয়, জনগণ সরকারের কথা না শুনেও তাদের কর্তব্য পালন করবেই! সরকার মানুক আর না মানুক! যদি তারা জনগণের পথ আটকাতে চায়, এবং এই কঠিন সময়ে আমাদের পবিত্র দায়িত্ব পালনে বাধা দেয়, তবে গৃহযুদ্ধের দায়ভার তাদেরই নিতে হবে।

আমি জানি, এই সরকার যেই জমিদারী কাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে আছে, তারা কখনোই চাইবে না জনগণ অস্ত্র ধরুক, যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিক, স্বাধীনতার জন্য লড়ুক। কারণ এই জমিদাররা ভয় পায়, একবার যদি জনগণ জাগে, তারা শুধু বাইরের শত্রুর বিরুদ্ধেই লড়বে না, বরং এসব সামন্তপ্রভুদের দাসত্ব ও নিপীড়নের বিরুদ্ধেও লড়াই শুরু করবে।

আমি জানি, এই জমিদাররা এসব চিন্তা করেই আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। তাই তারা জনগণকে এবং জনগণের আন্দোলনকে এবং তাদের অস্ত্র ধরাকে ভয় পায়।

আমি সরকারকে সরাসরি বেইমান বলছি না, তবে সত্যি কথা হলো, সরকারের আসল ভয়—জনগণের শক্তি। আর এ কারণেই তারা জানবাজ

মুজাহিদবাহিনীকে ঘেরাও করতে চায়, তাদের কার্যক্রম আটকাতে চায়।

আমি জনগণকে, বিশেষত জানবাজ মুজাহিদ ভাইদেরকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানাই! কোনো শক্তির চাপের মুখে তাঁরা যেন মাথা নত না করে এবং তাদের পবিত্র দায়িত্ব পালন থেকে বিরত না হয়।

যদি সরকার এই সতর্কবার্তা শোনে, জনগণের সংগ্রামে বাধা না দেয়, জানবাজ মুজাহিদ ভাইদের আটকানোর পরিকল্পনা বাদ দেয়, তাহলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব, এবং তাদের সীমাবদ্ধতা মেনে নেব। আমরা কেউ সরকারকে তার ক্ষমতার বাইরে কিছু করতে বলছি না। কেউ বলছে না, সরকার আজকেই বিনা প্রস্তুতিতে যুদ্ধ ঘোষণা করুক! তবে আমরা সরকারকে সতর্ক করছি—সাবধান! জনগণের হাত-পা বাঁধার চেষ্টা করবেন না! জনগণের সংগ্রামকে রুখতে আসবেন না! এ জাতি এখনো জাগ্রত, জানবাজ মুজাহিদ ভাইয়েরা সদা প্রস্তুত!

আমি খুব বুঝেশুনেই বলছি, আমাদের মুজাহিদ বাহিনী এখন সরকারের চেয়েও বেশি শক্তিশালী! তাঁরা দাঁড়ালে সরকারের নাভিশ্বাস উঠে যাবে।

আমরা ইংরেজদের সাথে লড়াই করব, ইংরেজদের খুন করব, ইংরেজদের রসদ সরবরাহ বন্ধ করে দেব... সরকার যদি আমাদের পথ ছেড়ে দেয়, ভালো। নইলে, বাধা দূর করতে আর পথ পরিষ্কার করতে জানবাজ মুজাহিদ বাহিনী মাঠে নামবে।

আমি যা বলছি, জেনেশুনেই বলছি। সরকারকে হুঁশিয়ার করছি, যদি সরকার মুজাহিদদের ঠেকাতে যায়, যদি অস্ত্রের আইন প্রয়োগ করতে চায়, তাহলে ভয়াবহ পরিণতি হবে। এটা সহজ কোনো ব্যাপার না। মুজাহিদ বাহিনী কাজ করতে বদ্ধপরিকর। ওদের পথে যে দাঁড়াবে, তার কপালে দুঃখ আছে! সরকার চাইলে লোক দেখানো দলগুলোকে ধরে রাখতে পারে, যেসব দল ঢাকঢোল পিটিয়ে রাস্তায় মিছিল করে। এসব দলের কোনো দাম নেই, সরকার ওদের ধরে রাখলেও উম্মাহর কোনো ক্ষতি

হবে না।

কিন্তু প্রকৃত জানবাজ মুজাহিদ বাহিনী—যারা নিজেদের পরিচয় দেয় না, নাম-ধাম গোপন রাখে, যারা নীরবে কাজ করে যায়, যাদের কোনো পদ-পদবী নেই, কোথায় তাদের ঘাঁটি, কোথায় তারা প্রশিক্ষণ নিচ্ছে কেউ জানে না, যারা কোনো খ্যাতি, পদবী বা পুরস্কারের আশায় লড়াই করে না, যারা নিজেদেরকে এই পবিত্র কর্তব্যের জন্য উৎসর্গ করেছে—তারা তাদের পথে এগিয়ে যাবে।

তাঁরা কখনোই সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করবে না, দেশ ও ধর্মের জন্য নিবেদিত এই লড়াই কিছুতেই সরকার বন্ধ করতে পারবে না। দেশের এমন সংকটময় সময়ে তাঁরা কোনো শক্তিকেই পেছন থেকে আঘাত করার সুযোগ দেবে না।

আমি সরকারকে দেশপ্রেমের খাতিরে সাবধান করছি—সরকারের ভালোর জন্য নয়, বরং দেশের ভালোর জন্য—এই দেশকে যেন দুই দিকে লড়তে না হয়।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষার নামে সংগ্রামী আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণ ও দমনের চেষ্টা, 'উগ্রবাদী' উপকরণ সরানোর অজুহাত তুলে শুদ্ধি অভিযানের যে কোনো প্রচেষ্টা রুখে দেওয়া হবে। এসব শব্দ বাক্যের ধোঁকা জনগণের সামনে এখন খুবই স্পষ্ট। সরকারের এহেন কর্মকান্ডে এমন সব প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে, যার দায়ভার কোনো সৎ বিবেকবান মানুষ নিতে পারবে না।

জানবাজ মুজাহিদ ভাইয়েরা... এগিয়ে যাও! এই পবিত্র লড়াইয়ের বিরোধী শক্তিদের চক্রান্ত নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না।

মাঝপথে এসে তোমরা অস্ত্র ফেলে দিও না, যুদ্ধের ময়দানে অস্ত্র ফেলে দেওয়া আত্মসমর্পণের নামান্তর।

এগিয়ে যাও! আল্লাহর পথে জিহাদ করো! কতল করো এবং শহিদ হয়ে

যাও।

এগিয়ে যাও! দখলদারদের অপবিত্রতা থেকে এই ভূমিকে মুক্ত করার গুরুদায়িত্ব তোমাদের কাঁধে!

এগিয়ে যাও! রবের নির্দেশে ঝড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ো। চূর্ণবিচূর্ণ করে দাও দখলদারদের সকল শক্তি, খুঁটি ও সহযোগীদের!

এগিয়ে যাও! মৃত্যু-আলিঙ্গন কামনা করো, ফিরে পাবে সম্মানের জীবন অথবা কাঙ্ক্ষিত শাহাদাত! তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে দুই কল্যাণের কোনো একটি।

> ‘আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে, তাদেরকে তোমরা মৃত মনে করো না। বরং তারা জীবিত, তাদের প্রতিপালকের কাছে তারা রিযিকপ্রাপ্ত।’ (সুরা আলে ইমরান: ১৬৯)

ফিলিস্তিনি বীরদের জন্য তোমরা কী করেছ?

আমি যখন সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের দীর্ঘ পদোন্নতির তালিকাগুলো দেখছিলাম, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিশাল বাজেটের অঙ্কগুলো দেখছিলাম, এবং সেই বিশাল বাজেটের পরেও অতিরিক্ত বরাদ্দগুলো পর্যালোচনা করছিলাম, তখন আমি সেই বীরদের সম্পর্কে একটি ছোট খবর বা ক্ষণিকের উল্লেখের জন্য উন্মুখ হয়েছিলাম, যারা তাদের জীবন উৎসর্গ করেছে এবং পেছনে রেখে গেছে দুর্বল সন্তান, অসহায় স্ত্রী এবং নিঃস্ব মায়েদের। কিন্তু আফসোস আমি এই বীরদের কোনো চিহ্ন বা খবর খুঁজে পাইনি; কোথাও তাঁদের স্মরণ বা তাঁদের জন্য একটা লাইন খুঁজে পাইনি।

এটা কিসের ইঙ্গিত দেয়? এটা ইঙ্গিত দেয় যে, বর্তমান মিশরের সেনাবাহিনীতে স্পিনক্স পাশার (Francis Reginald Wingate) আত্মা এখনও বিরাজমান, যিনি ছিলেন ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর একজন পরিদর্শক। এটা ইঙ্গিত দেয় যে, সাবেক ব্রিটিশ হাইকমিশনারের প্রভাব এখনো সেনাবাহিনীর নীতিনির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করে আছে। এটা ইঙ্গিত দেয় যে, ব্রিটিশদের রেখে যাওয়া প্রেতাত্মারাই এখনো রাষ্ট্রের কলকাঠি নাড়ছে।

আসলে সাদা চামড়ার ব্রিটিশরা মিশরের প্রশাসন ছেড়ে চলে যাওয়ার পর সেই পদগুলো শূন্য রেখে যায়নি; বরং বাদামী চামড়ার মনস্তাত্ত্বিক ব্রিটিশদেরকে সেখানে বসিয়ে গেছে। যারা তাদের মতোই আচরণ করছে, তাদের সুরেই কথা বলছে। পূর্ণ আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে বৃটিশদের লক্ষ্যই পূরণ করছে!

এই অঞ্চলে ব্রিটিশদের মূল কাজ ছিল মিশরীয়দের মনোবল ধ্বংস করা।

তারা এই জাতির মনে হতাশা, দুর্বলতা ও অক্ষমতার বীজ বপন করেছিল। তারা মিশরীয়দের বড় অংশের মনে এটা গেঁথে দিতে সামর্থ্য হয়েছে যে, তোমাদের পক্ষে কিছুই করা সম্ভব না। তোমরা অপারগ, অক্ষম এক জাতি! তাই বাস্তবতা মেনে নাও, এবং উপনিবেশিক প্রভুদের শাসন মেনেই চুপ থাকো।

তারা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল মিশরীয়দের সামরিক চেতনা ধ্বংস করতে। কারণ তারা জানত, যদি একবার মিশরীয়দের মনে যুদ্ধের চেতনা জেগে ওঠে, তাহলে সেটাই কাল হতে পারে উপনিবেশিকদের জন্য।

মাঠে ময়দানে বয়ান-বক্তৃতা দিয়ে, মিডিয়ায় লেখালেখি করে, রাস্তায় স্লোগান, চেঁচামেচি, চিৎকার আর করতালি দিয়ে উপনিবেশিক শাসনকে সামান্য দূর্বল করা সম্ভব না। তাই তারা চেয়েছিল, মিশরীয়রা যত ইচ্ছে বক্তৃতা দিক, যেভাবে মন চায় লিখুক, যত খুশি স্লোগান দিক। কিন্তু তারা যেন কোনোভাবেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত না হয়। এটাকেই তারা একমাত্র এবং গুরুত্বপূর্ণ থ্রেট হিসেবে গ্রহণ করেছিল। এই সত্য তারা আমাদের অনেক আগেই উপলব্ধি করতে পেরেছে।

সে কারণেই ব্রিটিশরা মিশরের সেনাবাহিনীকে সবসময় দুর্বল রাখতে সচেষ্ট ছিল। তারা এটাও নিশ্চিত করেছিল যে, সেনাবাহিনীতে চাকরি করা যেন এক ভয়াবহ বিপর্যয় হয়। তারা সেনাবাহিনীকে এমন দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছিল, যাদের মধ্যে কখনোই মিলন হবে না। তারা সেনাবাহিনীর অফিসারদের সৈন্যদের থেকে পুরোপুরি আলাদা করে রেখেছিল।

তারা অফিসারদের প্রচুর সুযোগ-সুবিধা দিত, এমনকি রাষ্ট্রের অন্যান্য কর্মকর্তাদের চেয়েও বেশি। আর সৈন্যদের এত কম বেতন দিত যে, তাদের বেতন বিশ্বের সবচেয়ে কম বেতনভুক্ত সৈন্যদের চেয়েও খারাপ ছিল। তারা অভিজাত পরিবার থেকে অফিসার নির্বাচন করত এবং সৈন্যদের

জন্য বাধ্যতামূলক সামরিক চাকরিকে দরিদ্র ও অসহায় পরিবারের জন্য শাস্তির সমতুল্য করে তুলেছিল।

পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ ছিল যে, সাধারণ সৈনিকদেরকে অফিসারদের ব্যক্তিগত চাকর হিসেবে ব্যবহার করা হতো, এমনকি তাদের বাড়ির কাজ করতেও বাধ্য করা হতো। এমন বর্বরতার উদাহরণ বিশ্বের অন্য কোনো সেনাবাহিনীতে ছিল না।

সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়া ছিল সাধারণ পরিবারের জন্য অভিশাপের মতো। দরিদ্র পরিবারের খরচ যোগানো একমাত্র ছেলেটিকে বাধ্যতামূলক সেনাসেবার নামে ধরে নিয়ে যাওয়া হতো। পেছনে পড়ে থাকতো হতদরিদ্র স্ত্রী, সন্তান, এবং বৃদ্ধ বাবা-মা। পাঁচ বছর ধরে তারা অনাহারে অর্ধাহারে মানবেতর জীবনযাপন করতে হতো।

তার সামান্য কপর্দকহীন বেতন দিয়ে পরিবারের নূন্যতম প্রয়োজন পূরণ করা সম্ভব হতো না। ফলে, তাকে পূর্ণ পাঁচ বছর পরিবার নিয়ে এভাবে দুঃখ, অপমান ও লাঞ্ছনার মধ্যে কাটাতে হতো, যা আমৃত্যু তার স্মৃতিতে তিক্ত অভিজ্ঞতা হিসেবে থেকে যেত এবং লাঞ্ছনার কালো দাগ হয়ে তার হৃদয়কে কুড়ে কুড়ে খেত।

ইংরেজরা সামরিক সেবার মতো সম্মানজনক পেশাকে অপমান, কলঙ্ক, পরিবার ধ্বংস, সংসার ভাঙার মতো এক মহা দুর্যোগে পরিণত করেছিল, মানুষ যা থেকে পালিয়ে বেড়াতো। সামরিক সেবা হয়ে গিয়েছিল সাধারণ মানুষের মনে দুঃখ-কষ্ট ও অপমানের প্রতীক।

অন্যদিকে, বিরাট অংকে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল জেনারেল আর সেনা অফিসারদের বেতন; যার উদ্দেশ্য ছিল—

* প্রথমত, অফিসার আর সৈন্যদের মধ্যে একটা বিশাল ব্যবধান তৈরি করা।
* দ্বিতীয়ত, সেনাবাহিনীর বাজেট এমনভাবে শেষ করা, যাতে

অস্ত্রশস্ত্রের জন্য আর কিছুই না থাকে।

* তৃতীয়ত, অফিসারদের এমন বিলাসী জীবন দেওয়া যাতে তারা সামরিক জীবনের কঠিন বাস্তবতা ভুলে যায়।

* চতুর্থত, সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যে লোভ-লালসা, স্বার্থপরতা ও বিলাসী জীবন হারানোর ভয় ঢুকিয়ে দেওয়া, যার ফলে তারা দেশের চরম সংকটেও নৈতিক দায়িত্ব আদায়ে অগ্রসর হবে না। বিশেষত স্বাধীনতার জন্য দেশের কাতারে দাঁড়িয়ে আরামদায়ক জীবনদাতাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে চাইবে না।

ইংরেজরা ভেবেছিল তারা সফল হয়েছে। তারা এই জাতির সামরিক চেতনা এমনভাবে শেষ করে দিয়েছে যে, যা আর কখনোই জেগে উঠবে না।

সামরিক জীবন হয়ে উঠেছিল এমন ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন, যার ভয়ে মানুষ কাঁপত, পরিবারগুলো আতঙ্কে থাকত, আর মানুষ অপমান আর ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচার জন্য পালিয়ে বেড়াতো।

কিন্তু এই উম্মাহর সহজাত শক্তি ছিল আরও প্রবল, আর তাদের বিশ্বাস ছিল আরও গভীর। মানুষের মনে এক নতুন আলোর জন্ম হয়েছিল, যা ইংরেজরা হিসেব করতে পারেনি। অথবা হয়তো তারা হিসেব করেছিল, কিন্তু তাদের হিসেব মেলেনি।

ইসলামের দীপ্ত শিখা আবার জ্বলে উঠেছে মুমিনদের অন্তরে। ঈমানের দীপ্ত শিখা তুলে ধরে ইখওয়ানুল মুসলিমুন এখন প্রকাশ্যে চলে এসেছে। সাম্রাজ্যবাদীদের ষাট বছরের পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। এই দেশে এখন এমন একদল মুজাহিদ আবির্ভূত হয়েছে, যারা আল্লাহর কাছে জীবন সওদা করেছে। এমন এক আত্মত্যাগী স্বেচ্ছাসেবক দল গঠিত হয়েছে যাদের কোনো পিছুটান নেই।

ইংরেজদের কূটচাল মুহূর্তের মধ্যেই তাদের বিরুদ্ধে চলে গেছে। যদি এই

বিপ্লব জেগে থাকে, তাহলে ইংরেজদের সকল ষড়যন্ত্রের জাল ছিঁড়ে যাবে। ভেঙ্গে পড়বে ওদের সব প্রতিরক্ষা দেয়াল। অচিরেই এই জাতির মধ্যে তার গৌরবময় সামরিক চেতনা ফিরে আসবে। গুঁড়িয়ে যাবে সাম্রাজ্যবাদের মসনদ।

কিন্তু তারা জানে, এই ফিদায়ী আন্দোলনের একমাত্র নতিজা বিজয়! এই আত্মত্যাগের ফলাফল শুধুই মুক্তি! এটাই সেই মহাশক্তি, যা উপনিবেশবাদকে ভেতর থেকে কাঁপিয়ে দিতে পারে। আর একবার যদি উপনিবেশিকরা পড়ে যায় তাহলে আর কখনো দাঁড়াতে পারবে না।

তাই তারা সিদ্ধান্ত নেয়—ইখওয়ানুল মুসলিমিনক গুঁড়িয়ে দিতে হবে! তাদের আত্মত্যাগ ও কোরবানির চেতনাকে দমন করতে হবে! এই ঈমানী আলোর জাগরণী শিখাকে নিভিয়ে দিতে হবে! ঘরে ঘরে ঈমানী আগুন জ্বালানো এই শক্তিকে নিঃশেষ করে দিতে হবে! এই জাতির চেতনাকে আবারো হতাশা ও নিরাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত করতে হবে!

তারা সিদ্ধান্ত নেয়—সব শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়ে ফিলিস্তিনে নবগঠিত মিশরীয় সেনাবাহিনীর কোমর ভেঙে দিতে হবে। তাদের বিধ্বস্ত অবশিষ্টাংশ যখন দেশে ফিরে আসবে, তাদের সামনে থাকবে শুধুই ধ্বংস হয়ে যাওয়া পরিজন ও শোকাতুর স্বজন। তখনই হবে এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উপযুক্ত সময়। এভাবে এই জাতি এমন দুর্দশার শিকার হবে, যা কখনো ভুলতে পারবে না।

এখানেই বাদামী চামড়ার ইংরেজরা (ইংরেজদের স্থানীয় দোসররা) তাদের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের সুযোগ পেয়ে যায়। তারা ভাবে—এই শহীদ পরিবার, ইয়াতিম বিধবা নারী-শিশু আর শোকার্ত স্বজন—সবার ওপর অবহেলার অভিশাপ চাপিয়ে দিতে হবে। তাদের এমন এক দৃষ্টান্তে পরিণত করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে কেউ দেশের জন্য জীবন দেওয়ার কথা ভেবে আঁতকে উঠে। জনগণের সামনে তাদেরকে এমন এক ভয়ংকর উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে, যা মানুষের আত্মমর্যাদা, সহমর্মিতা ও

সহযোগিতার অনুভূতি ধ্বংস করে দেবে।

আজ আমরা সেই করুণ দৃশ্যগুলোই অবলোকন করছি... হৃদয়বিদারক কাহিনিগুলো প্রত্যক্ষ করছি।

প্রশাসনের এমন অবহেলা আমরা আজ দেখছি, যা প্রমাণ করে—স্পেনক্সের অপচ্ছায়া এখনো সেনাবাহিনীর ওপর ছায়া বিস্তার করে আছে এবং ব্রিটিশ হাইকমিশনারের প্রেতাত্মারাই এখন রাষ্ট্রের কলকাঠি নাড়ছে।

পদোন্নতির দীর্ঘ তালিকা আর সামরিক বাজেটের বিশালতা দেখে সহজেই বুঝতে পারছি—রাজনীতি সেই আগেরটাই চলছে, দেশ পুরোনো লক্ষ্যেই এগিয়ে যাচ্ছে।

আমরা শহীদদের সরকারি স্বীকৃতি চাই। জানতে চাই রাষ্ট্র তাদের রেখে যাওয়া অসহায় সন্তান, বিধবা স্ত্রী আর শোকার্ত পরিবারের জন্য কী করেছে। কিন্তু আফসোস—আমরা এর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, কারণ শ্বেতাঙ্গ ইংরেজদের রেখে যাওয়া রাজনৈতিক আমানত স্থানীয় বাদামী চামড়ার ইংরেজরা রক্ষা করে চলছে।

এখন সময় এসেছে—এই অভিশপ্ত রাজনীতির পরিসমাপ্তি ঘটানোর। সময় এসেছে নিজেদের অস্তিত্বের প্রমাণ দেওয়ার। সুযোগ এসেছে, এই কথা ঘোষণা করার—আল্লাহ প্রদত্ত এই জিহাদি শিখা কেউ নেভাতে পারবে না।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিষাক্ত ছায়া যেন এখনও আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রের গভীরে মিশে আছে। অতীতের সেই উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ শাসকদের প্রেতাত্মাগুলো আজও অদৃশ্য সুতোর টানে কলকাঠি নাড়ছে।

হে আমার জাতি! কোথায় তোমার চেতনা?

হে আমার জনতা! কোথায় তোমার অস্তিত্ব?

মিশরের এসব পাশারা (উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা) আজ ফ্রান্সের কাছে এ

কথা প্রমাণ করতে মরিয়া হয়ে গেছে যে—তারা মিশরের কেউ নয়, তারা মিশরের জন্য নয়।

আজ আমাদের শপথ নিতে হবে, এই বাদামি ইংরেজ আর তাদের প্রভুদের আমরা এদেশ থেকে তাড়াবই। আমরা আমাদের শহীদদের রক্তের ঋণ শোধ করব। আমরা আমাদের দেশের মাটি থেকে এই গোলামীর চিহ্ন মুছে ফেলবো।

তাই আজ আমি তোমাদের বলি, ভয় পেয়ো না। মাথা উঁচু করে দাঁড়াও। বুকের পাটা শক্ত করে লড়াই করো। আমাদের দিন আসছে, আমাদের জয় হবেই। আর সেদিন আমরা এই বেইমানদের বিচার করব—জনগণের আদালতে।

মহান আল্লাহ সত্য বলেছেন—

> ‘আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব (কখনো) কিছুটা ভয়-ভীতি দ্বারা, (কখনো) ক্ষুধা দ্বারা, এবং (কখনো) ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা। আর আপনি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দিন—যারা বিপদে পড়লে বলে, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য, আর আমরা তাঁর দিকেই ফিরে যাব। তারাই তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে রহমত ও কল্যাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং তারাই সঠিক পথপ্রাপ্ত।’ (সুরা বাকারা: ১৫৫-১৫৭)

আত্মত্যাগের অঙ্গীকার ও ত্যাগের মিছিল

আজকের যুবসমাজ খরস্রোতার জোয়ারের মতো বিভিন্ন দল ও সংগঠনে ভিড় করছে। কিসের জন্য তাঁরা এত ব্যাকুল? কী পাওয়ার আশায় তাঁরা দৌড়াচ্ছে? এই ব্যাকুলতা ও ভিড়ের পেছনে রহস্য কী?

আমি এমন চিত্র দেখেছি, যেখানে হাজার হাজার যুবকের ধাক্কাধাক্কির চাপে সিঁড়ির রেলিং পর্যন্ত ভেঙে পড়েছে। আমি মুসলিম যুবসংঘের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে হাজার হাজার যুবককে দলে দলে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। দীর্ঘ প্রতীক্ষায় অস্থির হতে দেখেছি। দেখেছি মুসলিম ব্রাদারহুডের কার্যালয়ের চিত্র। তাদের রয়েছে যুবকদের গ্রহণ ও প্রশিক্ষণের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা। এই সংগঠন আজ অভিজ্ঞ ও নবীন কর্মীদের নিয়ে পরিপূর্ণ। এই যুবসমাজ কীসের আশায় ভিড় করছে? কিসের পেছনে তাঁরা ব্যাকুল হয়ে ছুটছে? এই আগ্রহ আর ব্যাকুলতার পেছনে রহস্যই বা কী?

আসলে তারা দুনিয়ার কোনো সম্পদের জন্য প্রতিযোগিতা করছে না। তাদের এই তীব্র ছুটে চলার পেছনে নেই কোনো পার্থিব লাভের আশা। তারা বিবাহ বা আনন্দ অনুষ্ঠানে অংশ নিতে ভিড় করছে না। বরং তারা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার জন্য ছুটছে! আত্মত্যাগের জন্য উদ্দাম এগিয়ে যাচ্ছে! জীবন বিলিয়ে দেওয়ার প্রতিযোগিতায় নেমেছে!

তারা চরম সংকটের মুহূর্তে দেশের আহ্বানে সাড়া দিচ্ছে। সংগ্রাম ও স্বাধীনতার ডাক শুনে ছুটে আসছে। কঠিনতম মুহূর্তে কর্তব্যের আহ্বান মেনে নিচ্ছে।

তারা জীবন দিচ্ছে, সম্পদ দিচ্ছে, নিজের ভবিষ্যৎ উৎসর্গ করছে। সব আশা-আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়ে জীবনের পিছুটান আর দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করছে। তারা সব কিছু বিলিয়ে দিচ্ছে, কিছুই নিচ্ছে না। অথচ মিশরের জনগণ বহুদিন ধরে সেসব নেতাদের কারণে কষ্ট করে আসছে, যারা সব কিছু নেয়, কিন্তু কিছুই দেয় না। তাঁরা নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দিচ্ছে, কিছুই গ্রহণ করছে না। অথচ মিশর দীর্ঘকাল ধরে দেখছে সেসব নেতাদের, যারা জনতার সর্বস্ব কেড়ে নিত, কিন্তু কিছুই দিত না।

এই যুবসমাজ তাদের আত্মত্যাগের মাধ্যমে এই জাতির অকৃতজ্ঞ, অযোগ্য এবং দায়িত্বে অবহেলাকারী নেতাদের ব্যর্থতা পুষিয়ে দিচ্ছে।

যুবকরা আজ সে পথেই হাঁটছে, যে পথে যুগে যুগে সকল মুক্তিকামী ও বীরেরা হেঁটেছে।

যে পথ মুক্তির, যে পথ গৌরবের, যে পথ স্বাধীনতার।

মৃত্যুর দুয়ারে এই যুবসমাজের ভিড় এবং মুক্তি বাহিনীর কাতারে নাম লেখানোর প্রতিযোগিতা প্রমাণ করে যে, এই জাতির জীবনে একটি নতুন ভোরের সূচনা হয়েছে। যে জাতির স্বাধীনতার স্পৃহাকে দমন করতে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শক্তি সত্তর বছর ব্যয় করেছে! তারা এই জাতির আত্মত্যাগের চেতনাকে সমূলে নিঃশেষ করার প্রয়াস চালিয়েছে! তারা এই জাতির মনে সৈনিক জীবন ও সামরিকতাকে ঘৃণ্য বস্তুতে পরিণত করেছে! কিন্তু এই জাতি মুহূর্তেই জেগে উঠেছে! ইংরেজদের চাপিয়ে দেয়া সব বোঝা মন থেকে ঝেড়ে ফেলেছে। যা উপনিবেশবাদী শাসকরা তাদের ওপর চাপিয়ে দিতে যুগ যুগ ধরে পরিশ্রম করেছে।

ঔপনিবেশিক শক্তি সমস্ত সক্ষমতা ব্যয় করেছিল এই জাতির ভেতর থেকে সামরিক চেতনাকে নির্মূল করার জন্য। এজন্য তারা অবলম্বন করেছে নানা কৌশল। তারা এমন এক সামরিক নিয়ম চালু করেছিল, যেখানে একমাত্র উপার্জনক্ষম ছেলেকে সামরিক বাহিনীতে পাঠানো ছিল

দরিদ্র শ্রেণির জন্য এক অভিশাপ। এর ফলে ধ্বংস হয়ে যেত একেকটি পরিবার। এই দরিদ্র শ্রেণির জন্য সামরিক বাহিনীতে যোগ দেয়া মানে ছিল একরাশ লাঞ্ছনা, ক্ষুধা ও বিপর্যয়!

তারা সেনাবাহিনীর অফিসারদেরকে আপামর জনসাধারণ থেকে আলাদা উচ্চবিত্ত পরিবেশ থেকে নিয়োগ দিত, যেন সাধারণ নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা সৈন্যদের দাস কিংবা পশুর মতো আচরণ করা সহজ হয়।

উপনিবেশিকরা সৈন্যদের মন থেকে জাতীয় মর্যাদার অনুভূতি মুছে দিয়ে মানবিক গৌরবের চেতনা ধ্বংস করতে চেয়েছে। সম্মান, সম্ভ্রম ও পবিত্র মূল্যবোধের প্রতি স্বভাবজাত আবেগকে নিঃশেষ করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে।

ঔপনিবেশিক শক্তির এই কালো থাবা থেকে কেউ মুক্ত ছিল না, সামরিক স্কুলের কোমলমতি ছাত্রদের নৈতিকতা নষ্ট করাসহ সৈনিকদের চরিত্র ধ্বংস করতে হীন কোনো অপচেষ্টা তারা বাদ রাখেনি; যেন সম্মান রক্ষার যেকোনো স্পৃহা এই জাতি হারিয়ে ফেলে। কারণ, যদি মানুষের মন থেকে সম্মান ও সম্ভ্রমের মূল্য হারিয়ে যায়, তাহলে দেশ মূল্যহীন হয়ে পড়বে, গৌরব বিলীন হয়ে যাবে এবং সেই পবিত্র আদর্শসমূহও তুচ্ছ হয়ে যাবে, যার জন্য একটি বাহিনী লড়াই করে।

এছাড়াও সৈন্যদের সাথে চরম অবমাননাকর আচরণ, কঠোর নিষ্ঠুরতা, অপমান, দুর্ব্যবহার এবং লাগামহীন গালাগাল—এসবই সৈনিক জীবনকে ঘৃণার বস্তুতে পরিণত করেছিল; এমন আতঙ্ক তৈরি করেছিল, যার ফলে জনমনে সামরিক নিয়োগের প্রতি ভয় ও আতঙ্ক জন্ম নেয়।

উপনিবেশিকরা এসব অপকর্ম ও কুটকৌশল চালিয়েছে মূলত সেই দিনটির ভয়ে, যেদিন হয়তো মিশর জেগে উঠবে এবং দখলদারদের বলবে: চলে যাও আমাদের দেশ ছেড়ে!

আজ আমরা সেই দিন দেখতে পাচ্ছি।

এতো কিছুর পরেও মিশর জেগেছে। গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে। মুহূর্তেই সব লাঞ্ছনা ঝেড়ে ফেলেছে! মিশরের তরুণরা আজ বিভিন্ন দল ও সংগঠনের দরজায় দলে দলে ভিড় করছে; চাকরি, সম্পদ বা কোনো পুরস্কারের আশায় নয়। বরং তারা মর্যাদা রক্ষার লড়াইয়ে জীবন দিতে চায়, দেশ রক্ষার জন্য শহীদ হতে চায়!

পূর্বে দলীয় প্রতিযোগিতা ছিল এই জাতির জন্য অভিশাপ, যখন তা ছিল কেবল ক্ষমতা ও সম্পদ দখলের লড়াই। কিন্তু আজকের এই প্রতিযোগিতা কল্যাণের, ইনশাআল্লাহ! কারণ এটি সম্পদ লাভের জন্য নয়, বরং আত্মত্যাগের জন্য। এটি শয়তানের পথে নয়, বরং মহান আল্লাহর পথে।

সুতরাং বাহিনী গঠন, শক্তি সংগ্রহ এবং লোক সংগ্রহের প্রতিযোগিতা চলতে থাকুক। প্রতিযোগীদের উচিত প্রতিযোগিতায় আরো অগ্রসর হওয়া!

সশস্ত্র বাহিনীগুলোর এই পবিত্র প্রতিযোগিতা চলমান থাকুক যতক্ষণ তা সঠিক পথে থাকে এবং মুক্তির অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে।

তরুণরা আজ যে কোনো বাহিনীতে যোগ দিক না কেন, এতে সে প্রকৃত পৌরুষ ফিরে পাবে, মর্যাদার পথে চলতে শিখবে। বিলাসিতা, আরামপ্রিয়তা ও অপব্যয়ের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে। নোংরামি, পাপাচার ও কলুষতা থেকে পরিশুদ্ধ হবে। কোরবানি ও আত্মত্যাগের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারবে। স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতার অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে।

এমন যুবক যদি যুদ্ধের পর বেঁচে ফিরে আসে, তবে জাতি তার জন্য গর্বিত হবে। আর যদি তাঁর ভাগ্যে শাহাদাত লিখা থাকে, তবে সে তার প্রভুর সঙ্গে মিলিত হবে সর্বোত্তম অবস্থায়— মহান উদ্দেশ্যে নিজেকে কোরবান করা একজন প্রকৃত মুমিন হিসেবে, যা তার অস্তিত্ব ও জীবনের চেয়েও বড়!

বিপদের ঘন কালো মেঘের মধ্যেও আজ বিজয়ের তারাগুলো ঝলমলে আলো নিয়ে উঁকি দিচ্ছে। যে দিন আমরা নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখবো। এই জমিনের ওপর আমাদের অযৌক্তিক লোভ-লালসা দমাতে পারবো। যে দিন আমাদের দৃষ্টি ক্ষুদ্র স্বার্থ ও ব্যাক্তিগত লালসার উর্ধ্বে উঠে সুউচ্চ লক্ষ্যের দিকে নিবদ্ধ হবে— সেদিনই আমাদের বিজয় ডঙ্কা বেজে উঠবে।

কঠিন পরিস্থিতি আমাদের বিপর্যস্ত করতে পারবে না; বরং পরিশুদ্ধ করবে, সুগঠিত করবে এবং জন্ম দিবে সত্যিকারের পুরুষ ও বীর যোদ্ধা।

দখলদার দস্যুরা আমাদের শক্তি দিয়ে পরাজিত করতে পারেনি; বরং আমাদের ভেতরে থাকা লোকদের মাধ্যমেই আমরা পরাজিত হয়েছি। আমরা মূলত সেদিনই হেরে গিয়েছিলাম, যেদিন আমরা এই ভ্রান্ত ধারণা মেনে নিয়েছি যে, শ্বেতাঙ্গরা আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, পশ্চিমা সভ্যতা-সংস্কৃতি আমাদের তাহজিব-তামাদ্দুন থেকে উত্তম। বিশ্বমানবতাকে দেওয়ার মতো আমাদের কিছুই নেই, আমরা এক ক্ষয়িষ্ণু জাতি!

বস্তুত, ব্রিটিশরা আমাদের শাসন করতে পারত না, যদি আমরা নিজেরাই তাদের সহযোগী না হতাম। আজ যখন আমাদের কিছু শ্রমিক তাদের সহযোগিতা করা বন্ধ করে দিয়েছে, তখন তারা নিজেদের রসদ জোগাড় করতেও হিমশিম খাচ্ছে।

আফসোস! এখনো কিছু বিশ্বাসঘাতক ঠিকাদার তাদের পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছে, একদল দেশদ্রোহী তাদের খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করছে, আর কিছু গুপ্তচর তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাচার করছে।

যদি এই বিশ্বাসঘাতকতা বন্ধ হয়, তবে দখলদারদের পায়ের তলার মাটি সরে যাবে, ক্ষমতার খুঁটি নড়ে উঠবে। তখন তাদের সামরিক শক্তিও কোনো কাজে আসবে না।

আমরা এই হুমকিতে ভীত নই যে, ইংরেজরা শক্তির বলে আবার গোটা

দেশে দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করবে। বরং, এটি আমাদের জন্য এক সুবর্ণ সুযোগ হবে—তাদের বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করার এবং তাদের সৈন্যদের বিক্ষিপ্ত করে সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার। এতে তারা সহজেই ফিদায়ী যোদ্ধাদের ফাঁদে পড়বে। যারা এই সামরিক পুনর্দখলের ভয় দেখাচ্ছে, তারা হয়তো মতলববাজ ষড়যন্ত্রকারী, নয়তো দুর্বল নির্বোধ।

বিজয় সর্বাবস্থায় আমাদেরই হবে, ইনশাআল্লাহ!

বিপ্লবীরা দেশের প্রতিটি কোণকে বিশ্বাসঘাতক, গুপ্তচর এবং ভীতুদের থেকে নির্মল করবে।

সেদিন, দখলদাররা কোনো সহযোগি খুঁজে পাবে না। যুদ্ধাস্ত্র আর সামরিক শক্তিও কোনো কাজে আসবে না। যেদিন আত্মোৎসর্গের এক দুর্দান্ত চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে দুই কোটি দেশপ্রেমিক জনতা দেশের প্রতি ইঞ্চি মাটিতে দখলদার শত্রুর জন্য ওত পেতে থাকবে।

আল্লাহর নাম নিয়ে সম্মানের এই পথে সকলের এগিয়ে চলা অব্যাহত থাকুক!

আল্লাহর বরকতে কল্যাণের এই মহৎ প্রতিযোগিতা দুর্দান্তভাবে এগিয়ে যাক!

ইহুদিদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

> মুমিনদের প্রতি শত্রুতায় মানুষের মধ্যে ইয়াহুদি ও মুশরিকদেরকেই তুমি সর্বাধিক উগ্র-কঠোর হিসেবে দেখবে... (সূরা মায়েদা: ৮২)

মুসলিম উম্মাহ আজ ইয়াহুদিদের চক্রান্ত ও কূটকৌশলের যে দুর্ভোগ ভোগ করছে, তা তাদের পূর্বসূরিরাও সহ্য করেছিল। কিন্তু দুঃখজনক সত্য হলো, মুসলিম উম্মাহ কুরআনের দিকনির্দেশনা ও আল্লাহ প্রদত্ত পথনির্দেশ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করছে না—

> তোমরা কি আশা করো যে তারা তোমাদের কথায় ঈমান নিয়ে আসবে? অথচ তাদের একটি দল আল্লাহর বাণী শুনত। অতঃপর তা ভালোভাবে বুঝার পরও জেনেশুনে বিকৃত করে দিত! যখন তারা মুমিনদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, তখন বলে: আমরা ঈমান এনেছি।' আর যখন তারা একে অপরের সঙ্গে নির্জনে মিলিত হয়, তখন বলে: 'তোমরা কি তাদেরকে সে সব কথা বলে দিচ্ছ, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য প্রকাশ করেছেন, যাতে তারা সেগুলোকে তোমাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করাতে পারে তোমাদের রবের দরবারে? তবে কি তোমরা বুঝতে পারো না? তারা কি জানে না যে, আল্লাহ তো তাদের গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুই জানেন? (সূরা বাকারা: ৭৫-৭৭)

মুসলিম উম্মাহ আজও সেই শিক্ষা গ্রহণ করছে না, যা দ্বারা তাঁদের পূর্বসূরিরা উপকৃত হয়েছিল। ফলে, ইসলামের সূচনাকালে সদ্য প্রতিষ্ঠিত

মুসলিম সমাজেও যেভাবে তারা মদিনার ইয়াহুদিদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিতে পেরেছিল, আজ তা করতে পারছে না।

আজও ইয়াহুদিরা তাদের ধূর্ততা ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে তাদের দ্বীন থেকে পথভ্রষ্ট করার অপচেষ্টা করছে, কুরআন থেকে বিমুখ করতে চাচ্ছে, যাতে মুসলমানরা কুরআন থেকে তাদের প্রকৃত অস্ত্র ও পুরোনো রসদ সংগ্রহ করতে না পারে। ইহুদিরা ততক্ষণ নিরাপদ বোধ করে, যতক্ষণ এই উম্মাহ তার প্রকৃত শক্তি এবং নির্মল জ্ঞানের উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে।

যে বা যারাই এই উম্মাহকে তার দ্বীন ও কুরআন থেকে দূরে সরাতে চায়, সেই ইহুদিদের দালাল, এবার সে বুঝে করুক বা না বুঝে, ইচ্ছায় করুক বা অনিচ্ছায়।

যতদিন এই উম্মাহ তার একমাত্র আশ্রয়—যার মধ্যে তার অস্তিত্ব, শক্তি এবং বিজয় নিহিত—ঈমানি বিশ্বাস, ঈমানি মানহাজ ও ঈমানি শরিয়ত থেকে বিচ্যুত থাকবে, ততদিন ইয়াহুদিরা নিরাপদে ষড়যন্ত্রে করতে পারবে।

এটাই উম্মাহর একমাত্র পথ, এটাই পথের দিশা।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মদিনায় ইয়াহুদিদের একটি বিশেষ অবস্থান ছিল। তাদের সাথে ছিল মদিনাবাসীর সামাজিক চুক্তি ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক। তখনো তাদের শত্রুতা স্পষ্টভাবে প্রকাশ্যে আসেনি। এছাড়া মুসলমানদের মনেও তখনো একথা পুরোপুরি গেঁথে যায়নি যে, দ্বীনই একমাত্র বন্ধন, দ্বীনই 'ওয়াতান'! ঈমান-আকিদাই সম্পর্ক ও চুক্তির একমাত্র ভিত্তি। দ্বীন-ঈমানের সাথে সাংঘর্ষিক কোন চুক্তি, কোন সম্পর্ক টিকে থাকতে পারে না।

এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ইয়াহুদিরা মুসলিম সমাজে সংশয়-সন্দেহ ও বিভ্রান্তি তৈরিতে তৎপর ছিল। তখন মুসলিম সমাজের কিছু লোক তাদের কথায় কান দিত এবং তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গিয়েছিল।

এমনকি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইহুদিদের চক্রান্তের প্রতিরোধে ব্যবস্থা নিতে চাইতেন, তখন তাদের পক্ষে সুপারিশ করার দুঃসাহস দেখানো লোকও ছিল।

উদাহরণস্বরূপ, যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু কাইনুকার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে চাইলেন, তখন মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবন উবাই তাদের জন্য সুপারিশ করেছিল এবং এ ব্যাপারে সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুব চাপাচাপিও করেছিল।

ইসলামের শত্রুরা কেবল তরবারি ও বর্শা নিয়ে উম্মাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ নামেনি, ইসলামের বিরুদ্ধে কেবল ঢাল-তলোয়ারের যুদ্ধের জন্য উসকে দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি। বরং, তাদের প্রথম আঘাত ছিল আমাদের আকিদা-বিশ্বাসের ওপর! তারা সংশয় সন্দেহের বীজ বপন করে, অপপ্রচার এবং নানা ধরণের মিথ্যা ছড়িয়ে মুসলিম উম্মাহর ভিত্তি দুর্বল করতে চেয়েছিল।

তারা জানত এবং আজও খুব ভালো করেই জানে যে, এই উম্মাহকে দুর্বল করা সম্ভব কেবল তাদের আকিদা দুর্বল করার মাধ্যমে। মুসলিমদের ঈমান দুর্বল হলে তারা দুর্বল হয়ে পড়বে, তাদেরকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে পরাজিত করতে পারলেই ময়দানে পরাজিত করা সম্ভব হবে। এজন্য তাদের প্রথম আঘাত ছিল ঈমানের ওপর আকিদার ওপর। কারন, আকিদাই মুসলমানের শক্তি। বিশ্বাসই তাঁর অস্তিত্ব। ঈমানই তাঁর মুক্তি।

কিন্তু যতদিন তাঁরা ঈমানের রজ্জু দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকবে, আল্লাহর পথে অবিচল থাকবে, কালেমার পতাকা উত্তোলন করে রাখবে, আল্লাহর দলের অন্তর্ভুক্ত থাকবে, এবং শুধুমাত্র এই নিসবতকে (সম্পর্ক) গৌরবের উৎস মনে করবে, তাবৎ দুনিয়ার কোনো শক্তি তাদের পরাজিত করতে পারবেনা।

এ কারণেই মুসলিম উম্মাহর সবচেয়ে বড় শত্রু সেই ব্যক্তি, যে তাদের ঈমান থেকে উদাসীন করে, আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে, এবং প্রকৃত

শত্রু ও তার গভীর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে বিভ্রান্ত করে।

মুসলিম উম্মাহর সঙ্গে তাদের শত্রুদের প্রকৃত যুদ্ধ হল ঈমানের যুদ্ধ। এমনকি যখন শত্রুরা মুসলমানদের ভূমি, সম্পদ, অর্থনীতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ দখল করতে উদ্যত হয়, তখন সর্বপ্রথম তারা মুসলমানদের আকিদা বিশ্বাস দুর্বল করার হীন অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়। কারণ দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে তারা এটা জানতে পেরেছে যে, ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান, শরয়ী মানহাজে অঢল এবং শত্রুর চক্রান্ত সম্পর্কে জ্ঞাত এই জাতিকে তারা কখনো পরাজিত করতে পারবে না। তাই তারা ও তাদের দালালরা সর্বদা আপ্রাণ চেষ্টা চালায় মুসলিমদের প্রকৃত ময়দান থেকে বিভ্রান্ত করতে, যেন মুসলমানরা তাদের প্রকৃত শত্রু ও যুদ্ধের বাস্তবতা ভুলে বসে । আর এই সুযোগে তারা নিরাপদে শোষণ চালাতে পারে।

বিশ্বাসের প্রাচীরে সংশয়ের ফাটল তৈরি এবং বিশ্বাসকে দুর্বল করার যত হাতিয়ার দিন দিন আবিষ্কার হচ্ছে তার সবগুলোই শত্রু আমাদের আকিদা নষ্ট করতে ব্যবহার করছে। এবং সেই একই উদ্দেশ্যে! আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "আহলে কিতাবদের একটি দল খুব করে তামান্না করে, যদি তোমাদের পথভ্রষ্ট করতে পারত!" (সুরা আলে ইমরান: ৬৯)

এই কারণেই কোরআন শুরুতেই এই বিষাক্ত অস্ত্রের মোকাবিলা করেছে।

কোরআন মুসলমানদের দৃঢ়ভাবে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখে, ইহুদী খৃষ্টানদের ছড়ানো সন্দেহ ও বিভ্রান্তির আপনোদন করে। ইসলামের মহান বাস্তবতা, এই দ্বীনের মহত্ত্ব ও সত্যতা ফুটিয়ে তোলে। মানব সভ্যতার ইতিহাসে জমিনে এই দ্বীন ও বিশ্বাসের অবদান ও গুরুত্ব তুলে ধরে।

কোরআন উম্মাহর শত্রুদের চক্রান্ত ও তাদের গোপন অভিপ্রায় সম্পর্কে জোরালো সতর্ক করে এবং তাদের ধ্বংসাত্মক কৌশল, ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি তাদের শত্রুতা-বিদ্বেষের কথা স্পষ্ট জানিয়ে দেয়।

কোরআন আমাদেরকে এই বিশ্বজগতে শক্তির প্রকৃত উৎস, ভারসাম্যতা ও তার বাস্তব গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত করে। কোরআন আমাদেরকে শত্রুদের দুর্বলতা, আল্লাহর দৃষ্টিতে শত্রুর তুচ্ছতা, তাদের বিভ্রান্তি ফাস করে দেয়।

শত্রুর অপরাধ যেমন আল্লাহর অবতীর্ণ দ্বীনের বিকৃতি, যুগেযুগে নবীদের হত্যা ইত্যাদি স্পষ্ট করে দেয়।

সর্বোপরি, কোরআন মুসলমানদের আশ্বস্ত করে যে, আল্লাহ তাঁর বান্দার সাথে আছেন, তিনিই একমাত্র মালিক, তিনি যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন, যাকে ইচ্ছা অপদস্থ করেন, এবং তিনি কাফের ও ইয়াহুদিদের তাদের কুকর্মের জন্য কঠোর শাস্তি দেবেন, যেমন তিনি পূর্ববর্তী মুশরিকদের দিয়েছিলেন।

এই উম্মাহ যুগে যুগে বহুবার ইহুদিদের চক্রান্ত ও ধোঁকাবাজির শিকার হয়েছে।

> "হে আহলে কিতাব! তোমরা কেন সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে দাও এবং সত্য গোপন করো, অথচ তোমরা তা জানো?" (সুরা আলে ইমরান: ৭১)

এটাই ইহুদী খৃষ্টানদের স্বভাব— তারা সত্যকে মিথ্যার সাথে গুলিয়ে ফেলে এবং ধোঁকাবাজি করে। মুসলমানদের উচিত এই প্রবৃত্তি সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং সতর্ক থাকা।

এই চক্রান্ত ও ধোঁকাবাজির পথ তারা ইতিহাসের শুরু থেকে আজ অবধি অনুসরণ করে আসছে। প্রথমে ইহুদিরা এই পথ বেছে নেয়, তারপর তাদের অনুসরণ করে ক্রুসেডাররা।

দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ধরে তারা ইসলামী ঐতিহ্য ও তুরাসে এমন সব সমস্যা ঢুকিয়ে দিয়েছে, যা উন্মোচন করতে শত শত বছর লেগে যেতে পারে! তারা সত্য ও মিথ্যাকে একসাথে মিশিয়ে দিয়েছে ইসলামী তুরাসে।

তবে, কোরআন চির অক্ষত অবিকৃত, কারণ এর সংরক্ষক স্বয়ং আল্লাহ তাআলা।

তারা ইসলামের ইতিহাস ও তার ঘটনাপ্রবাহে এবং রিজালের (মহামানবদের জীবনীতে) মধ্যে বহু সমস্যা তৈরি করেছে। সত্য মিথ্যার মিশ্রণ, অপবাদ ও অপব্যাখ্যার পথ অবলম্বন করেছে।

তারা হাদিসে নববী নিয়েও চক্রান্ত করেছে। হাদিসের নামে বানোয়াট কথা রটিয়েছে। তবে আল্লাহ তাদের মোকাবিলায় এমন বিজ্ঞ ব্যক্তিদের দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন, যারা হাদিসের বিশুদ্ধতা যাচাই ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করেছেন। যদিও মানুষের প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ।

এমনকি তারা কোরআনের ব্যাখ্যার মধ্যেও ষড়যন্ত্র প্রবেশ করিয়েছে।

কিন্তু এর চেয়েও ভয়ংকর এক ষড়যন্ত্র তারা করেছে—তারা নিজেদের গড়া কিছু লোক ও নেতাকে ইসলামের ক্ষতি করার জন্য গোপনে মুসলিম সমাজে ঢুকিয়ে দিয়েছে!

শত শত, হাজার হাজার লোক ইসলামী বিশ্বে তাদের গোপন চর হিসেবে কাজ করেছে এবং এখনো করছে। যারা আজ প্রাচ্যবিদ ও প্রাচ্যবিদদের অনুসারীরূপে আত্মপ্রকাশ করছে। আজ তারা এমনসব দেশে চিন্তাধারার গুরুত্বপূর্ণ পদ দখল করে রেখেছে, যেগুলোর জনগণ নিজেদের মুসলিম বলে দাবি করে!

তারা বহু ব্যক্তিকে মুসলিম সমাজে সেলিব্রেটি হিসেবে দাঁড় করিয়েছে, অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা জায়নবাদের হাতে গড়া পুতুল মাত্র। এসব চর ইসলামের শত্রুদের পক্ষে এমন সব কাজ আঞ্জাম দিচ্ছে, যা তারা নিজেরা করার ক্ষমতা রাখে না!

এই চক্রান্ত আজও চলছে এবং প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে।

কিন্তু এই ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হলো আল্লাহর

সংরক্ষিত এই কিতাব আল-কোরআনের আশ্রয় গ্রহণ।

আজ আমাদের মুক্তির একমাত্র উপায় হলো কোরআনের কাছে ফিরে আসা এবং বর্তমান যুগের ক্রমাগত যুদ্ধ ও ষড়যন্ত্রের মাঝে কোরআনের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী পথ চলা।

ইহুদিদের সংশয় ছড়ানোর এই ষড়যন্ত্র মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে আজও অব্যাহত রয়েছে—

"আহলে কিতাবের একটি দল (একে অন্যকে) বলে, মুসলিমদের প্রতি যে কিতাব নাযিল হয়েছে, দিনের শুরু দিকে তো তাতে ঈমান আনবে আর দিনের শেষাংশে তা অস্বীকার করবে। হয়ত এভাবে মুসলিমগণ (-ও তাদের দীন থেকে) ফিরে যাবে।" (সুরা আলে ইমরান-৭২)

এটা এক জঘন্য কৌশল। তাদের ইসলাম গ্রহণের ভান অতপর আবার তা ত্যাগ করা দুর্বল মন ও চিন্তার মানুষকে দ্বীন সম্পর্কে বিভ্রান্তিতে ফেলে দেয়। তারা মনে করতে থাকে, ইহুদিরা ইসলাম গ্রহণ করার পর নিশ্চয়ই এমন কোনো গোপন ত্রুটি বা দুর্বলতা আবিষ্কার করেছে, যার কারণে তারা স্বধর্মে ফিরে গেছে! ফলে তারা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে দুই দিকের মাঝে দোদুল্যমান হয়ে পড়ে এবং দৃঢ়তার সাথে ইসলামকে আঁকড়ে ধরতে পারে না।

এই কৌশল এখনো চলছে। তবে, যুগের পরিবর্তন, মানুষের চাহিদা ও আগ্রহের সাথে মিল রেখে নব রূপে, নতুন মোড়কে। ইসলাম বিরোধী শক্তি যখন বুঝল যে, মুসলমানরা এত সহজে এই চক্রান্তে পা দেবে না, তখন তারা নতুন নতুন ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করা শুরু করলো।

আজ ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলোর পক্ষে মুসলিম বিশ্বেই রয়েছে বিশাল এক বাহিনী, এরা শত্রুর গুপ্তচর। অথচ তারা মুসলিম সমাজে প্রফেসর,

দার্শনিক, ডক্টর, গবেষক, কখনোবা লেখক, কবি, শিল্পী ও সাংবাদিক সেজে বসে আছে! তারা ইসলামী নামও ধারণ করে, কারণ তারা মুসলিম পরিবার থেকেই এসেছে। এমনকি এদের কতেক তথাকথিত ইসলামি

স্কলার হিসেবেও পরিচিত!

এই বিশাল বাহিনী মুসলমানদের বিশ্বাসকে দুর্বল করে দেওয়ার জন্য নানা উপায়ে কাজ করছে—গবেষণা, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, সাংবাদিকতা, দর্শন, মনোবিজ্ঞান—সবকিছুর মাধ্যমে। তারা ইসলামের মৌলিক শিক্ষা ও শারীয়াকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে, শরীয়ার বিকৃত ব্যাখ্যা দিচ্ছে। আকিদা ও শরীয়ার প্রাচীরে সমানতালে আঘাত হেনে চলেছে। দ্বীন ইসলামের উপর তারা আজগুবি সব অপব্যাখ্যার বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে। ইসলামকে 'সেকেলে' 'অচল' বলে বলে ধারাবাহিক আক্রমণ করে যাচ্ছে। ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়ার এবং জীবনের সব ক্ষেত্র থেকে ইসলামকে দূর করার অপচেষ্টা করে যাচ্ছে। যেন তারা জীবনের ব্যাপারে ইসলাম নিয়ে সঙ্কিত বা ইসলামের ব্যাপারে জীবন নিয়ে শঙ্কিত!

এছাড়াও, এমন ধারণা, দৃষ্টান্ত, আদর্শ ও নীতিমালা প্রচার করছে যা মানুষের অনুভূতি ও আচরণের ক্ষেত্রকে ইসলামী বিশ্বাস ও আদর্শের বিপরীত দিকে ঠেলে দেয় এবং তা ধ্বংস করে দেয়। আর এই নতুন মতবাদ ও ধারণাগুলোকে ঠিক ততটাই সাজিয়ে উপস্থাপন করা হয়, যতটা ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধকে বিকৃত ও কলুষিত করতে করা হয়।

তারা মানুষের প্রবৃত্তিকে উসকে দিচ্ছে, ব্যক্তি স্বাধীনতার ধোঁয়া তুলে অবাধ উশৃঙ্খল বানিয়ে দিচ্ছে। নৈতিকতার ভিত ভেঙে দিচ্ছে, যা স্বচ্ছ বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তারা পৃথিবীজুড়ে পঙ্কিলতা ছড়িয়ে দিচ্ছে, সভ্যতার ইতিহাস বিকৃত করছে, ইসলামী গ্রন্থের বক্তব্যকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করছে!

তবুও নাকি তারা মুসলমান! কারণ তাদের ইসলামী নাম রয়েছে! এই নাম শো করেই তারা দিনে ইসলাম সমর্থন করে, আবার রাতে এসব করে কুফরিতে লিপ্ত হয়। এভাবে তারা ঠিক ইহুদীদের সেই পুরনো আচরণেরই পুনরাবৃত্তি করছে।

"সকালবেলা ইসলাম গ্রহণের ভান করো, –তোমাদের ইসলামী নাম তো আছেই– আর সন্ধ্যায় তা অস্বীকার করো, যাতে মুসলমানরা দ্বিধান্বিত হয়ে তাদের দ্বিন থেকে ফিরে যায়।"

এই কৌশল যেন ইসলামের ধ্বংস কামনা করা আমাদের সমমনা ছাড়া অন্য কেউ জানতে না পারে।

তাদের আদর্শ হলো— "কেবল তাদেরই বিশ্বাস করো, যারা তোমাদের ধর্ম অনুসরণ করে।"(সুরা আলে ইমরান: ৭৩)

ইহুদিদের এজেন্টদের আচরণ ঠিক এরকমই। তারা পর্দার আড়ালে একে অপরের সাথে সমঝোতা করছে, তাদের সবার লক্ষ্য একটাই—ইসলামি বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করা।

তাদের এই ঐক্যবদ্ধতা ক্ষেত্র বিশেষে কোনো চুক্তি বা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সংঘটিত নাও হতে পারে। তবে তাদের উদ্দেশ্য এক —ইসলামের ধ্বংস । এটা আসলে মূল প্রভুর ধার্যকৃত কাজ সম্পাদনের ব্যাপারে এক দাসের সঙ্গে আরেক দাসের বোঝাপড়া।

তারা একে অপরের প্রতি আস্থা রাখে, গোপনে নিজেদের আসল উদ্দেশ্য ভাগ করে নেয়, কিন্তু বাইরে এসে ভিন্ন চেহারার ভান করে।

এই বিশ্বব্যবস্থা আজ তাদের পক্ষে। পরিবেশ তাদের অনুকূলে।

আর যারা সত্যিকারার্থে এই দিনের বাস্তবতাকে উপলব্ধি করেছে, যারা মুসলমানদের জাগ্রত করতে সক্ষম তাদের হয় হত্যা করা হচ্ছে, নয়তো নির্বাসনে পাঠানো হচ্ছে!

কোরআন যে ইহুদিদের সম্পর্কে এতো বেশি আলোচনা করেছে। তাদের দুষ্ট মানসিকতার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছে। এটি আসলে কোনো কাকতালীয় বিষয় নয়, বরং ইতিহাসে এমন কোনো জাতির নজির নেই, যারা বনি ইসরাইলের মতো এতটা নিষ্ঠুরতা, অকৃতজ্ঞতা এবং নবীদের

(আ.) প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা দেখিয়েছে।

তারা নবীদেরকে হত্যা করেছে, জবাই করেছে, এমনকি করাত দিয়ে শরীর কেটে টুকরো টুকরো করেছে। এটি এমন এক ঘৃণ্য অপরাধ, যা কোনো জাতি সত্যের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ দাঈদের বিরুদ্ধে করতে পারে না! তারা সবচেয়ে ভয়ংকর কুফর করেছে, সবচেয়ে জঘন্য সীমা লঙ্ঘন করেছে এবং সবচেয়ে ভয়াবহ গুনাহ করেছে। তাদের প্রতিটি ক্ষেত্রে এমন ভয়ানক কর্মকাণ্ড রয়েছে, যার তুলনা আর কোথাও নেই!

যেই জাতি নিজেদের নবীদের নির্মমভাবে হত্যা করতে পারে, জবাই করতে পারে এবং করাত দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করতে পারে—তাদের কাছ থেকে আর কী আশা করা যায়? তারা তো যে কোনো জাতির রক্তকেই হালাল মনে করবে, নিজেদের বিদ্বেষ ও পাপাচারকে চরিতার্থ করার জন্য যে কোনো নোংরা কৌশল ও নিষ্ঠুরতা অবলম্বন করবে।